দৈনিক ইত্তেফাক
তারিখ 23 JUN 2007
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

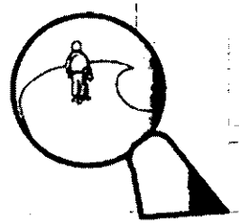

পথে প্রান্তরে

পথচারী

ফেলকরা ও ড্রপআউট ছাত্রছাত্রীদের জন্যেও ভাবতে হবে

মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশ বাংলাদেশে একটি বড় ঘটনা। পত্রপত্রিকা ও টেলিভিশনে তা ফলাও করে প্রকাশ করা হয়। যারা পাস করে তাদের পরিবারে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। বাজারে মিষ্টির দোকান মুহূর্তে মিষ্টিশূন্য হয়ে পড়ে। একটি ছেলে বা একটি মেয়ে এগার/বারো বছর পড়াশুনা করেছে যে সার্টিফিকেট পাওয়ার আশায় তার সাফল্যের সন্ধান মেলে এই পরীক্ষা পাসের মধ্য দিয়ে। পরীক্ষা পাসের সংবাদে উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের আনন্দিত হবারই কথা। তবে সংবাদ মাধ্যমে বেশী স্থান পায় যারা সবচেয়ে ভাল ফল করে। অর্থাৎ জিপিএ-৫ পায়। ইদানীং লক্ষ্য করা গেছে, পরীক্ষায় জিপিএ-৫ বেশী পাচ্ছে শহরের ভাল স্কুলগুলো। ফল প্রকাশের পর এই স্কুলগুলোয় আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। পত্রপত্রিকা ও টেলিভিশনের পর্দা জুড়ে তাদের ছবি প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশে যে পরিবেশ বিরাজ করছে তা নিশ্চয়ই কারো জন্য সুখকর নয়। পত্রিকা খুললে যে সংবাদ চোখে পড়ে তা পাঠকদের কোনভাবেই আনন্দিত করে না। সেখানে স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা পাসের ও দেশব্যাপী আনন্দের সংবাদ সকলকে সাময়িকভাবে হলেও আনন্দিত করে, এটা কম কথা নয়।

কিন্তু কয়েনের উল্টো দিকের মত এর আরো একটি দিক আছে, যা একেবারেই দুঃখের। যত ছাত্রছাত্রী পাস করে তার প্রায় সমসংখ্যক বা তার কিছু কম ফেল করে। ফল প্রকাশের পর এদের নীরব কান্নায় এক একটি পরিবারের বাতাস ভারী হয়ে ওঠে। বাড়ীগুলোতে নেমে আসে গভীর অন্ধকার। এদের খবরাখবর সংবাদ মাধ্যমে তেমনভাবে প্রকাশিত হয় না। যে টুকু হয় তা যথার্থ নয়। কেননা এই লাখ লাখ কিশোর-কিশোরীর ভবিষ্যৎ কী তা কেউ বলতে পারে না বা জানতে পারে না। এমনকি তারা পরীক্ষায় কেন অকৃতকার্য হল সে বিশ্লেষণও কেউ গুরুত্ব দিয়ে করে না। অথচ এই বিপুলসংখ্যক কিশোর-কিশোরীর অকৃতকার্যকারিতা তাদের পরিবারের উপর শুধু প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না, প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে গোটা সমাজ ও রাষ্ট্রের উপর। কেননা এদের কিছুসংখ্যক পরবর্তী বছর আবার পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়। আর বেশীরভাগ লেখাপড়া ছেড়ে দেয়। এরা তখন কোথায় যায়, কী করে, তা কেউ সঠিকভাবে বলতে পারে না।

একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, সবাই দেখে পরীক্ষায় কতজন অবতীর্ণ হয়েছিল এবং তাদের মধ্য থেকে কতজন পাস করেছে, কিন্তু [illegible] না। বিভিন্ন কারণে ড্রপ আউট হয়ে যায়। দেখা যায় সাত বোর্ডে এ বছরের পরীক্ষার জন্য নিবন্ধিত হয়েছিল ১১ লাখ ৫৭ হাজার ৯২০ জন ছাত্রছাত্রী। এদের মধ্যে দশম শ্রেণীতে ওঠে ৫ লাখ ৪৪ হাজার ৫৯৫ জন। পুরানো ছাত্রছাত্রীসহ পরীক্ষা দেয় ৬ লাখ ১৩ হাজার। পাস করে প্রায় সাড়ে ৩ লাখ। আর ফেল করে ২ লাখ ৬৪ হাজার। পাসের হার ৫৭ দশমিক ৩৭ শতাংশ। যারা পাস করেছে তাদের সবাই উপায় নেই যে, স্কুলের মত কলেজেও এক শ্রেণীর শিক্ষক রয়েছেন যাদের প্রশিক্ষণমান আশাব্যঞ্জক নয়। এই শ্রেণীর বেশীরভাগ শিক্ষক চাকরি পেয়েছেন স্বজনপ্রীতি ও প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতির কারণে। কলেজগুলোর মান উন্নত করা কঠিন হয়ে পড়েছে যে সমস্ত কারণে এটা তার মধ্যে একটি।

সন্দেহ নেই, জিপিএ-৫ যারা পেয়েছে তারা অপেক্ষাকৃত ভাল কলেজে ভর্তি হবার যে উচ্চতর শ্রেণীতে ভর্তি হবে তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। তাই এখন লেখালেখি হচ্ছে জিপিএ-৫ পাওয়া ছাত্রছাত্রীদের উচ্চতর ক্লাসে ভর্তির সমস্যা নিয়ে। কেননা এবার গতবারের চেয়েও বেশী সংখ্যক ছাত্রছাত্রী জিপিএ-৫ পেয়েছে। তারা চাইবে ভাল কলেজে ভর্তি হতে। কিন্তু হাতে গোনা ভাল কলেজে তত আসন বা সীট নেই। ফলে ভাল রেজাল্ট করেও ভাল কলেজে পড়ার সুযোগ তারা পাবে না। এমনকি কেউ কেউ পত্রিকায় লিখেছে, দেশে যত কলেজ আছে এবং সেখানে যত সীট আছে তার চেয়ে অনেক বেশী ছাত্রছাত্রী এবার এসএসসি পাস করেছে। সে জন্য তারা পরামর্শ সুযোগ পাবে বা সুযোগ হয়ে যাবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এটা নিশ্চিত করবে। কারণ সব শিক্ষকের বেতন-ভাতা দেয় সরকার। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণমান নিশ্চিত করার দায়িত্বও তাদের। কিন্তু সমস্যা অন্যখানে। সেটা হল, স্কুলপড়ুয়া ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এই যে বিপুল সংখ্যক ড্রপ আউট, তার কারণ কী? তারা কি পরিবেশগত কারণে, অর্থাভাব বা পারিবারিক দারিদ্র্যের কারণে, নাকি শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ মান উন্নত না হওয়ার কারণে স্কুল ছেড়ে চলে যায়? অন্য কারণও থাকতে পারে। তবে তা খুঁজে বের করা প্রয়োজন এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক। এই সঙ্গে আর একটি জায়গায়ও চিন্তা করি, তা হলেও তাদের জন্য দেশের করণীয় আছে। একটা কথা মনে রাখা প্রয়োজন। বাংলাদেশের মত এত মাস্টার ডিগ্রি কোন উন্নত দেশেও নেই। মাস্টার ডিগ্রি নেয় ওই সব দেশে শিক্ষকতা ও গবেষণা করার জন্য। কেউ মাস্টার ডিগ্রি নিয়ে কোন অফিসে গেলে তাকে ওভার কোয়ালিফিকেশনের অজুহাতে ফিরিয়ে দেয়া হয়। চাকরি দেয়া হয় না। চাকরি দেয়া হয় যারা গ্র্যাজুয়েট অথবা ডিপ্লোমাধারী—তাদের। আসলে উন্নত দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা বাস্তবমুখী এবং ম্যান পাওয়ার তৈরীর উপযোগী।

বাংলাদেশের মত এত মাস্টার ডিগ্রি কোন উন্নত দেশেও নেই। মাস্টার ডিগ্রি নেয় ওই সব দেশে শিক্ষকতা ও গবেষণা করার জন্য। কেউ মাস্টার ডিগ্রি নিয়ে কোন অফিসে গেলে তাকে ওভার কোয়ালিফিকেশনের অজুহাতে ফিরিয়ে দেয়া হয়। চাকরি দেয়া হয় না। চাকরি দেয়া হয় যারা গ্র্যাজুয়েট অথবা ডিপ্লোমাধারী—তাদের। আসলে উন্নত দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা বাস্তবমুখী এবং ম্যান পাওয়ার তৈরীর উপযোগী।

উন্নত দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা পর্যালোচনা করে আমাদের দেশের বাস্তব অবস্থার উপযোগী একটি শিক্ষা ব্যবস্থা তৈরী করা আবশ্যক। মনে রাখা প্রয়োজন আমাদের কাজের লোকসংখ্যা অনেক। তার উপর এরা দরিদ্র। এই অবস্থায় যারা স্কুল-কলেজে ড্রপ আউট হবে বা কোন রকমে পাস করবে তাদের উপযোগী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি করতে হবে। এগুলো টেকনিক্যাল স্কুল হতে পারে। হতে পারে ইনস্টিটিউট বা কলেজ। সম্প্রতি আমি অস্ট্রেলিয়া গিয়েছিলাম। সেখানে দেখেছি সেফ বা বাবুর্চি, চুপকাটা এসবের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কোর্স আছে। আমাদের দেশের অনেক ছেলেমেয়ে সে দেশে গিয়ে সেসব কোর্সে ভর্তি হচ্ছে এবং হাতে-কলমে সেসব বিষয়ে শিখছে, চাকরির জন্য। বাংলাদেশে এ ধরনের অসংখ্য প্রতিষ্ঠান সরকারী সহযোগিতায় খোলা উচিত—যাতে আমাদের সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা সেসব প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়ে বিভিন্ন কোর্সে সার্টিফিকেট বা ডিপ্লোমা নিয়ে সরাসরি কাজে যোগ দিতে পারে। এতে সরকার ও পিতার অর্থ অযথা অপচয় হবে না। এ জন্য কলেজগুলোতে প্রচলিত বিষয়ের পাশাপাশি বিভিন্ন টেকনিক্যাল বিষয় খোলা উচিত। সরকার উদ্যোগ না নিলে এটা হবে না। কেননা দৃষ্টিভঙ্গিটা আমাদের কাছে নতুন।

আসল কথা দেশে কাজের সুযোগ করে দিতে হবে। তাহলে ছাত্রছাত্রীদের নিম্ন গ্রেডধারী অংশ স্কুল পাস করে কলেজের প্রচলিত বিষয়ে না পড়ে টেকনিক্যাল বিষয়ে পড়বে এবং তাড়াতাড়ি কাজে নামবে। আইএ, বিএ বা এমএ পড়ে বেকার হওয়া থেকে এটা তাদের কাছে শ্রেয় মনে হবে। আমি তো মনে করি কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের এত ভীড়ের কারণ দেশের কাজের অভাব। অফিসের পিওন হওয়ার জন্য কলেজ পাস দরকার নেই। স্কুল পাস যথেষ্ট। আবার ব্যাঙ্কে [illegible] মাস্টার ডিগ্রি প্রয়োজন...